Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 08-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.076

স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাসে দেশ বিভাগের প্রতিচ্ছবি

দেবব্রত লাহিড়ী, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বরুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*
ড. চম্পক ডেকা, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, জগন্নাথ বরুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 28.03.2026; Accepted: 14.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper aims to highlight the condition of the refugees of undivided India before the Partition. There are a great many unseen stories that were not recorded in the texts of the time, and the texts that were able to depict the picture of Partition are very few. However, the efforts made by historians, writers, and novelists of Bengal have made it easier for readers to trace the incidents of the past.

This paper once again highlights the importance of the history of Partition and the novels written in the post-Partition period of India. It deals with the issues of immigrants or refugees as represented by the characters in the novels of Atin Bandyopadhyay, Prafulla Roy, and Jarasandha, to name a few. The paper focuses primarily on the aspects of characterization and character development as shaped by the after-effects of the Partition of India.

It also briefly discusses the Partition of Bengal that took place before the country was divided. The textual analysis in this paper focuses on the works of Jarasandha, Atin Bandyopadhyay, and other such writers, analyzing the deep impact of Partition on society, culture, the economy, race and primarily literature.

Keywords: Partition, Independence, Bangla Upanyas, India, Pakistan etc

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮ জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটি রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। ১৫ আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনরূপে নির্দিষ্ট হয়। ভারতবর্ষ দুভাগে ভাগ হ'ল। একটি হচ্ছে ভারত, অন্যটি পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটি ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তান,যা আগে ছিল পূর্ব বাংলা। তারও আগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গ প্রদেশকে দুভাগ করা হয়েছিল জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সুতরাং দেশভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা জনমানসে রয়েই গিয়েছিল। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট দেশভাগের ফলে সে তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্ণতা প্রায়। ইতিহাস এখানেই থেমে থাকল না। তারও প্রায় ২৫ বছর পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বাংলা দেশ নাম নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

সে যাই হোক দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তরা ভারতের ত্রিপুরা, অসম, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। আরও কিছু সংখ্যা লঘু পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যান এবং বিবিধ সংকটের মধ্যে পড়তে থাকেন। স্বাধীনতা উত্তর কিছু কিছু বাংলা উপন্যাসে এইসব ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। ছিন্নমূল অসহায়

মানুষদের মর্মন্তুদ কাহিনি যেমন প্রতিফলিত হতে থাকে ঠিক তেমনি যেসব সংখ্যালঘুরা ভিটে আঁকড়ে পড়ে রইলেন, তাদের সংকটের কথাও তেমনি প্রতিফলিত হতে থাকে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে। দেশভাগের বলি স্বরূপ এই সব ভাগ্যহীন মানুষদের মূল্যবোধ অনিবার্যভাবে বদলে যেতে থাকে। এই ছবিও ফুটে উঠতে থাকে কিছু কিছু উপন্যাসে। স্বাধীনোত্তরকালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানতঃ অতীন বন্দোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমলেন্দু চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জরাসন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগ জনিত সংকটের ছাপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসকে কালগত দিক থেকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা উপন্যাস এবং অন্যটি হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস। দেশভাগের আগেকার বাংলা উপন্যাসে আমরা সামাজিক দ্বন্দ্ব কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ পেয়েছি। এধারা বহমান রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও সেযুগের প্রধান-অপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা। বাংলা উপন্যাসে যখন দেশভাগের কালোছায়া পড়ল, তখনি বলা বাহুল্য পূর্ববর্তীধারা আমূল পাল্টে যায়।

সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পন স্বরূপ। বাংলা উপন্যাসে এবং ছোট গল্পে দেশ বিভাগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় উপন্যাসকে নিয়ে। তাই আমরা শুধু উপন্যাসেই আমাদের বক্তব্য সীমিত রাখব। উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে লেখা বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ কিভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তারই ইতিহাস এই সমস্ত উপন্যাস গুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রতিনিধিস্থানীয় কতকগুলি উপন্যাস সমূহের আলোচনা এইভাবে করা যেতে পারে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (২য় খণ্ড, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে এক অভিজাত হিন্দু পরিবারকে নিয়ে লেখা হয়েছে। সেই হিন্দু পরিবারটি হচ্ছে সোনাদের পরিবার। সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের গ্রামীন জীবন, হিন্দু এবং মুসলমানদের সম্পর্ক, নরনারীর স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ অতি সুন্দর ভাবে গদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দিকে ভারত বিভাগের কথা এসেছে। দেশ ভাগের পর সোনাদের পরিবার এবং উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র নিজেদের পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এরই ফলে উপন্যাসে এসেছে উদ্বাস্তু জীবন।

এই খণ্ডে কাহিনির দুটো অংশ-প্রাক্ উদ্বাস্তু জীবন ও উদ্বাস্তু জীবন। দুই বিপরীত অবস্থায় উদ্বাস্তু জীবনের কষ্টদায়ক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই নিজের ভিটেমাটিকে ভালবাসে। মানুষের রক্তে দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা জীবনকে পূর্ণতা দান করে। হৃদয়ের যন্ত্রণা, হৃদয়ের কষ্ট এই উপন্যাসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা মর্মস্পর্শী।

তাঁর পরবর্তী দুটি খণ্ড হচ্ছে 'অলৌকিক জলযান' (১ম খণ্ড ১৩৮৪, ২য় খণ্ড ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ) ও 'ঈশ্বরের বাগান' (১ম খণ্ড ১৩৮৯, ২য় খণ্ড ১৩৯৪, ৩য় খণ্ড ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)। এই দুটি খণ্ডে রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণা যেন সোনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে। তার চাকুরী, সমুদ্রের জীবন, কলকাতার জীবন, রাজবাড়ীতে কর্মগ্রহণ, আপনজনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব প্রভৃতি নানা ঘটনা সোনার জীবনকে পরিবর্তিত করেছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেন মনুষ্য জীবনের সব দিকের সমস্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই লেখাকে মহাকাব্য ধর্মী উপন্যাস বলে দাবি করা যায়। এই তিনটি উপন্যাস পড়ে আমরা সহিষ্ণু উদার চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সচেতন হই। এই কারণে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্বিতীয় বলা চলে।

তাঁর আরও একটি উপন্যাস হচ্ছে 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এই উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লেখা। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হচ্ছে বিলু। তারা কিভাবে নূতন আশ্রয় লাভ করেছে, ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছে, দৈনন্দিন জীবনযাপন করত-এই সমস্ত ঘটনা লেখক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনিরও আবির্ভাব ঘটেছে। বিলুর জীবনে ছোড়দি, লক্ষ্মী ও মিমি এই তিন নারী এসেছে এবং তারা যথাসময়ে বিদায় নিয়েছে। এই তিন নারীর সঙ্গে বিলুর জটিল-মধুর সম্পর্ক পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। পুনশ্চ অংশে লেখক খুবই সংক্ষেপে উপন্যাসের পরিণতি টেনে এনেছেন। লক্ষ্মীর আত্মহত্যা ও বিলুর বাড়ি ফিরে আসার মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। সমাপ্তি এবং পুনশ্চ এর মধ্যে কিন্তু কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের নামকরণ অবশ্য যথার্থ হয়নি। ঘরবাড়ি নয়, বিলুর বড় হয়ে ওঠাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী' (১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসটি 'মানুষের ঘরবাড়ি'র পরবর্তী খণ্ড। 'মানুষের ঘরবাড়ি'র কিশোর বিলু 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসে যুবকে পরিণত হয়েছে। সেই যুবক বিলুর কাহিনিই এখানে মুখ্য। দুটি উপন্যাসে দেখা যায় বিলু বাড়ি থেকে পালিয়ে ব্যক্তিগত সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিলুর জীবন যন্ত্রণার কথাই লেখক তাঁর উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন।

তাঁর 'আবাদ' (১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসটি একদল বাস্তহারা মানুষের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। 'আবাদ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা বিবৃত করেছেন।

বাস্তব জীবনে উদ্বাস্তু হয়ে দিন যাপন অতি কষ্টকর। দারিদ্র্য, অবক্ষয়, সংস্কার বিশ্বাসের বিলুপ্তি অনেক ঔপন্যাসিককে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বলেছেন, আর্থিক কারণেই উদ্বাস্তুরা বিপর্যস্ত নয়। ভাল-মন্দ, ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ, কামনা চরিতার্থ, জমি, নারীর অধিকার নিয়ে সমস্যা-এই সমস্ত জটিলতা বাইরে থেকে আসেনি। এসেছে নিজেদের জীবন থেকে। বেথুয়াডহরী ক্যাম্পের মানুষ মুর্শিদাবাদের দুর্গম অঞ্চলে নতুন করে আবাদ ও আবাস করলে জীবনের সমস্যা দেখা দিবেই। লেখকের মতে, "এই নতুন আবাসে দু-পক্ষ। এক পক্ষের মাতব্বর চিন্তাহরণ, অন্য পক্ষের কে কেউ জানে না। তবে উপেন রায়ের আচরণ এবং পারিবারিক মর্যাদা ললিত এবং অনেককে কিছুটা সমীহ করতে শিখিয়েছে।"

উপন্যাসের প্রাণই হল শুভ ও অশুভ শক্তির প্রতিক্রিয়া। তার একদিকে চিন্তাহরণ এবং অন্যদিকে উপেন রায়। এদের উদ্বাস্তু জীবনে বাইরের কোন প্রভাব ছিল না। দরিদ্র মানুষের বেশির ভাগই চিন্তাহরণের পক্ষ নিয়ে কুকর্ম করে। চিন্তাহরণ এদের দ্বারা বাসনা পরিতৃপ্ত করে। আর অন্যদিকে এর প্রতিবাদ করে উপেন রায়, ললিত প্রভৃতি। পরিণামে শুভ শক্তির জয় হবে-এ স্বাভাবিক কথা। মল্লিকের কুষ্ঠ ব্যাধি, যতীনের সর্পদর্শনে মৃত্যু, ললিতের সন্তান লাভ ইত্যাদি ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়কে নিশ্চিত করে। কিন্তু এর মধ্যে উদ্বাস্তুজনতা তাদের জীবন প্রবাহকে চালিত করতে থাকে ও ফসলের আবাদ করতে থাকে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) এক মননশীল উপন্যাস। এই উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারী চরিত্র হচ্ছে বিমি বা বিমলা। দেশবিভাগের ফলে বিমি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সে যাযাবরের মত আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং হলুদমোহন ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছে। হলুদ মোহন ক্যাম্প হচ্ছে এক উদ্বাস্তু শিবির এবং শেষে সে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়ে পৃথক বাড়িতে উঠেছে। বিমি হচ্ছে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'গোষ্ঠবিহারীর জীবন যাপন' (১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে বরিশালের স্বাধীনতা সংগ্রামী গোকুল ভট্টাচার্যের বড় ছেলে হচ্ছে গোষ্ঠবিহারী। দেশভাগ হওয়ার ফলে

গোকুলবাবু পরিবার নিয়ে কলকাতার বেলেঘাটার এক বস্তি তুল্য ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি টি.বি.তে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দেশভাগ হওয়ার পর বরিশালেই তাঁর বড় মেয়ে অপহৃতা হয়। তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ে হয়নি। তাঁর একছেলে হচ্ছে সমাজবিরোধী। গোষ্ঠবিহারী হচ্ছেন একজন সাধারণ চাকুরে। কোনমতে তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন। গোষ্ঠবিহারীর জীবন থেকে কেন স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা হারিয়ে গেল, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তা আলোচনা করেছেন।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জনপ্রিয় শিল্পীদের ত্রুটিগুলি তাঁর উপন্যাসে নেই, এজন্য তিনি মননশীল পাঠকের প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন। 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ) উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা এক উপন্যাস। দেশভাগ হওয়ার ফলে মানুষ কিভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাস আর পাঁচটি উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসের মতই সাধারণ স্তরের। একসময়ে মানুষের ভিটেমাটি সব ছিল, কিন্তু দেশভাগ হওয়ার ফলে তাদের খাদ্য বস্ত্রের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, এইরকম দেড় শতাধিক মানুষ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসে। এক উদ্বাস্তু নারীর জীবনের কথা উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। মুক্তা হচ্ছে সেই নারী। উপন্যাসে একাধিক চরিত্র আছে। কিন্তু মুক্তাই হচ্ছে আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আশ্রয়হীন মুক্তা উদ্বাস্তু জীবনের আগে দুর্দশার মধ্যে পড়েনি। দেশে তাদের ছ-সাত বিঘে জমি ছিল। তাতেই তাদের চলে যেত। দেশ ভাগের আগে মুক্তার বাবা মারা যায়। তার কাকা অনন্ত দাস সেই জমি বিক্রি করে দেয়। পরে তারা শিয়ালদহ ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়। কলকাতায় এসে মুক্তা বহু আঘাত বেদনা ভোগ করেছিল। এর পর বলাই এর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত বহুবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও তাদের মিলন হয়। উপন্যাসের অনেক ঘটনা বিশ্বাস করা যায় না। এই উপন্যাসে আকস্মিকতা, অতিনাটকীয়তা এবং অবাস্তবতা অনেক আছে। দুর্বল কাহিনি, অবিশ্বাস্য ঘটনা, 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'কে উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ করেছে। বিবিধ দুর্বলতা থাকা সত্বেও উপন্যাসটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে আশ্রিত মানুষরা কিভাবে ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তা বর্ণনা করেছেন এবং এইরকম দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না।

জরাসন্ধ তাঁর 'মানসকন্যা' (১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে এক উদ্বাস্তু-নারীর চরমতম সঙ্কটের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। নারী জীবনের এক ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উদ্বাস্তু নারীর ধর্ষনজনিত অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কথা এই উপন্যাসে আলোচনা করা হয়েছে। হরবিলাস ডাক্তার হচ্ছেন এই উদ্বাস্তু জীবনের আলোচক। শ্রোতা হচ্ছেন লেখক। ডাক্তার তাঁর সহকর্মী নার্স ধর্ষিতা শুভার কাহিনি লেখককে শুনিয়েছেন।

দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে হরবিলাস ডাক্তার তাঁর গ্রামের মেয়ে ও সহকর্মী নার্স শুভাকে নিয়ে দেশ ছাড়লেন। কিন্তু বর্ডারে ট্রেন হঠাৎ থেমে যায়। সশস্ত্র গুণ্ডারা তাদেরকে আক্রমন করল। হরবিলাস ডাক্তার আহত হলেন। শুভাকে জোর করে সশস্ত্র গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেল। হরবিলাসও অর্ধমৃত অবস্থায় ভারতে এলেন এবং উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় নিলেন। শুভাও সর্বস্ব হারিয়ে এল। তার সন্তান হল। কিন্তু শুভা সেই অবৈধ সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি। শুভার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে হরবিলাস ডাক্তার সেই সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। কিশোরী মেয়েটির মনে তার জন্মরহস্য কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কিনা সেই সব বিষয়ে লেখক নীরব থেকেছেন। এখানেই ঔপন্যাসিক জরাসন্ধের দুর্বলতা। ধর্ষিতা উদ্বাস্তু-নারীর অবৈধ সন্তানকে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচিত হতে পারত কিন্তু জরাসন্ধ সে পথে যাননি।

বাংলা সাহিত্যে অবৈধ সন্তান নিয়ে লেখা কয়েকটি উপন্যাস আমাদের চোখে পড়ে। কুপার্স ক্যাম্পে হরবিলাস ডাক্তার শুভার মত আরও বহু উদ্বাস্তু নারী দেখেছেন, যাদের জীবনেও এইরকম বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। সকলেরই ইতিহাস এক। সঙ্গে যে সমস্ত পুরুষ ছিল, তাদেরকে মেরে ফেলেছে কিন্তু ওদের মারেনি। এইরকম একটি সিরিয়াস ও মর্মস্পর্শী বিষয় যেভাবে ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপাশা' (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে বিপাশার জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে। বিপাশা হচ্ছে একজন বাঙালি মেয়ে এবং তার মা ছিলেন পাঞ্জাবী। সে শিয়ালকোটে মানুষ হয়েছে। দেশভাগের সময় ভারতে পালিয়ে আসার সময় তার বাবা আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাণ। বিপাশা এক পাঞ্জাবী সর্দারের হাত ধরে ভারতে আসে। তখন তার বয়স মাত্র বার বৎসর। রিফিউজি-উইমেন্স ক্যাম্পে প্রথমে আসে। সেখানে উদ্বাস্তু মেয়েদের বিক্রি করার চেষ্টা চলতে থাকে। তারা বিপাশার দিকেও হাত বাড়ায়। কিন্তু বিপাশার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তারা তা করতে পারেনি। এরপর থেকে বিপাশা আর ক্যাম্পে ফিরে যায়নি। সে এক খ্রীষ্টান মিশনে আশ্রয় পেয়েছিল। সেখানে তাকে খ্রীষ্টান করার চেষ্টা চলতে থাকে। বিপাশার জন্য তা ব্যর্থ হয়। তারপর এক হিন্দু সন্নাসীর অনাথ আশ্রমে সে স্থান পায়। সেই আশ্রমটি দিল্লিতে ছিল এবং আশ্রমে স্কুলও ছিল। তিন বছর বিপাশা সেখানে ছিল এবং সেখানে বাংলা মাধ্যমে সে লেখাপড়া করতে লাগল। রিফিউজী ছাত্রী হিসাবে বৃত্তিও পেল। তিন বছর পর খ্রীষ্টান মিশনারীদের কলেজে সে ভর্তি হল। বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্যেও বিপাশা নিজেকে ঠিক রেখেছিল। অবশেষে ভারত সরকারের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের কাজ সে পায়। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বিপাশার স্বনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'দূরভাষিনী' (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে বাহ্যত: এক মহিলা টেলিফোন অপারেটরের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্ত:স্বরূপে এক উদ্বাস্তু পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাই বর্ণিত হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ দেশ, গ্রাম সমস্ত কিছু ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজেদের মান-সম্মান সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছে, তারই কথা ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বলেছেন।

গিরীনবাবু হচ্ছেন বরিশালের গুহঠাকুরতা বংশের সন্তান। দেশের বাড়িতে তাদের মান-সম্মান সমস্ত কিছুই ছিল। দেশ-ভাগ সব কিছু তাদের কেড়ে নিল। গিরীনবাবু উদ্বাস্তু হলেন। ছেলে-মেয়ে নিয়ে কলকাতায় উঠলেন। জীবিকার প্রয়োজনে আলকাতরা ও কেরোসিনের আড়তে কাজ নিলেন এবং মেয়ে বীণা হল টেলিফোন অপারেটর। বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংঘাত প্রায় লেগেই থাকে। বীণার যারা পুরুষ বন্ধু ছিল তাদেরকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। মেয়েও তার বাবার সমস্ত কিছু মেনে নিতে নারাজ। শেষে অবশ্য তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং বীণার সঙ্গে বিমলের বিয়ে হয়েছে। দেশভাগের আগে এরা আদৌ দরিদ্র ছিল না। দেশ-ভাগ এদেরকে নি:স্ব করে দিয়েছে। এই রকম একটি উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনি 'দূরভাষিণী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বিদিশা' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, দেশ ভাগ হওয়ার পর অপ্রকৃতস্থা দিদি ও কিশোরী বোনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদিশা কলকাতায় আসে, শিক্ষকতা গ্রহণ করে এবং কর্মক্ষেত্রে মতভেদ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করে। উপন্যাসটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত। বিদিশার আত্মমর্যাদাবোধ, দায়িত্বসচেতনতা এবং প্রতিবাদী ভূমিকার কথাও উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন।

নারায়ণ সান্যাল তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। এই তিনটি উপন্যাস হল 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প' (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'বল্মীক' (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ), এবং 'অরণ্যদণ্ডক' (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ)। ঔপন্যাসিক 'বকুলতলা

পি.এল.ক্যাম্প' উপন্যাসে উদ্বাস্তু-ক্যাম্প ও উদ্বাস্তু জনতার জীবনালেখ্য বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে ঋতব্রত কিন্তু কাহিনির কথক হচ্ছেন লেখক নিজেই। উপন্যাসের মূল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ঋতব্রত-ক্যাম্পের তরুণ এঞ্জিনিয়ার।

পরিচারিকা কুসুমের মর্মান্তিক পরিণতি এবং উদ্বাস্তু নারী কমলার সঙ্গে ঋতব্রতের প্রেম ও পরিণয় কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। ঋতব্রতের সান্নিধ্যে দুই উদ্বাস্তু নারী কুসুম ও কমলা এসেছে এবং এদের পরিণতি ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কুসুমের প্রতি স্নেহ এবং কমলার প্রতি অনুরাগ- ঐ দুটি মুখ্য ঘটনায় ঋতব্রতের পক্ষে মি: সঞ্জীব চৌধুরী, রতন প্রমুখ ব্যক্তি ছিল এবং বিপক্ষে ছিল ডাক্তার সাধুচরণ, ভৈরবচন্দ্র, বড়খোকা ইত্যাদি এবং কাহিনিকে এরা সংঘর্ষমুখর ও গতিময় পরিণতি দান করেছে।

নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' ঘটনা প্রধান এক উপন্যাস। দেশভাগ হওয়ার ফলে একটি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি এখানে দেখানো হয়েছে এবং সেই পরিবারটি হচ্ছে হরিপদ মাষ্টারের পরিবার। হরিপদ মাষ্টারের করুণ কাহিনির সঙ্গে উদ্বাস্তু কলোনিটিও গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেই কলোনিটি হচ্ছে উদয়নগর। কাহিনিতে উদয়নগর কলোনির বাস্তুচ্যুত মানুষের বস্তুনিষ্ঠ জীবন ইতিহাস বর্ণনা করে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে, 'বল্মীক' এক তথ্যধর্মী জীবননিষ্ঠ মহিমান্বিত রচনা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

নারায়ণ সান্যালের উদ্বাস্তু জীবনকে নিয়ে লেখা তৃতীয় উপন্যাসটি হচ্ছে 'অরণ্যদণ্ডক'। এই উপন্যাসে লেখক দণ্ডকারণ্যের রুক্ষ ও আরণ্যক পরিবেশে বাস্তুহীন মানুষের পুনর্বাসন ও জীবন সংগ্রামের কথা বলেছেন এবং সর্বোপরি তাদের জয়যুক্ততার কথাও বলেছেন। দেশভাগ হওয়ার ফলে যশোর জেলার কমলপুর গ্রামের মানুষ যাযাবরের মতো ভাসমান অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় পেল। বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাদের পুনর্বাসন কিভাবে সম্ভব হলো, লেখক তার বর্ণনা করেছেন দীর্ঘ কাহিনি, একাধিক চরিত্র, বহুবিধ ঘটনা এবং অজস্র তথ্য পঞ্জীর দ্বারা। কমলপুর গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠান, পারস্পরিক স্নেহ-প্রীতি, আর্থিক সচ্ছলতার ও বিশদ বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটি কয়েকটি কাণ্ডে বিভক্ত অরণ্য, অ-যোদ্ধা, উত্তরকাণ্ড প্রভৃতি। রামায়ণ-উল্লিখিত দণ্ডকারণ্য এই উপন্যাসের পটভূমি বলে ঔপন্যাসিক এইরকম কাণ্ড বিভাগ করেছেন। তবে এই রকম বিভাগের কোন তাৎপর্য নেই। এই উপন্যাসে অবশ্য অনেক কিছুর অভাব রয়েছে। প্রফুল্ল রায় তাঁর, 'নোনা জল মিঠে মাটি' (১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে আন্দামানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বলেছেন। ঔপন্যাসিক আন্দামানের দূরত্ব প্রকৃতির চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে রচনা করেছেন। একেবারে চোখে দেখা বাস্তবকে লেখক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

দেশভাগের প্রভাব যে বাংলা উপন্যাসে পড়েছে-সেগুলোর সংখ্যা কম নয়। সীমিত পরিসরে সবগুলোর আনুপূর্বিক পর্যালোচনা সম্ভব নয়। উপরে আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু কিছু উপন্যাসের আলোচনা করে দেখিয়েছি যে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সেগুলোতে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে- যা মহাকালের দরবারে দলিল হয়ে থাকবে। ছিন্নমূল মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনি আজও পাঠককে হতবাক করে দেয়। আমরা আগেই বলেছি কথা সাহিত্যের দুটি ধারাই ছোট গল্প ও উপন্যাসে দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু যে উদ্বাস্তুরাই দেশভাগের একমাত্র ফসল তা নয়। দেশভাগের খড়্গ উদ্বাস্তু ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যাওয়া অনেক সংখ্যা লঘুদের জীবনে নেমে আসে-আমাদের ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিকেরা সেসব সংখ্যালঘুদের কথাও তাঁদের উপন্যাসে সমব্যাথী হয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে আমাদের এই আলোচনায় দেশভাগের ফল হিসেবে প্রথমত ও প্রধানত উদ্বাস্তুদেরই দেখিয়েছি।

পরিশেষে বিনীতভাবে একটি কথা বলতে চাই- বহু সংগ্রামের পর স্বাধীনতা যখন দেশভাগের মাধ্যমে এল, সে সময় বাঙালির সমাজ জীবনের উপর দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যায়। এ তরঙ্গ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় সমস্ত মূল্যবোধেই আমূল পাল্টে দেয়। এই এত বড় একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুব কম পরিমান উপন্যাসই পেয়েছি। এ এক বিস্ময়কর বিষয়। আমি জানি না পঞ্জাবের সাহিত্যে দেশভাগের করালছায়া কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলায় এ নিয়ে বলিষ্ঠ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে বটে - কিন্তু সংখ্যার আধিক্য থাকলে যেন দেশভাগের মত বড় একটি বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। অবশ্য যেগুলো উপন্যাস আমরা অধ্যয়ন করেছি, সেগুলোর মধ্যেই স্বাধীনোত্তর কালের দেশবিভাগের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৪১।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬১।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (২য় খণ্ড)। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৭১।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন। অলৌকিক জলযান। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন। মানুষের ঘরবাড়ি। নাথ ব্রাদার্স পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৮।
৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ। নির্বাস। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৯।
৭. চক্রবর্তী, অমলেন্দু। গোষ্ঠবিহারীর জীবন যাপন। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। বিপাশা। বিভাস, কলকাতা, ১৯৫৯।
৯. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। দূরভাষিণী। আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৫২।
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। বিদিশা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪।
১১. সান্যাল, নারায়ণ। বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫৫।
১২. সান্যাল, নারায়ণ। বল্মীক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৫।
১৩. সান্যাল, নারায়ণ। অরণ্যদণ্ডক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬১।
১৪. রায়, প্রফুল্ল। নোনা জল মিঠে মাটি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।